

ছোট গল্প

রাজরানী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



কাল তোমার ভালো লাগে নি চণ্ডীকে নিয়ে বকুনি। ও একটা ছবি মাত্র।
কড়া কড়া লাইনে আঁকা, ওতে রস নাই। আজ তোমাকে কিছু বলব, সে
সত্যিকার গল্প।

কুসমি অত্যন্ত উৎফুল্ল হয়ে বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই বলো। তুমি তো সেদিন
বললে, বরাবর মানুষ সত্যি খবর দিয়ে এসেছে গল্পের মধ্যে মুড়ে।
একেবারে ময়রার দোকান বানিয়ে রেখেছে। সন্দেশের মধ্যে ছানাকে
চেনাই যায় না।

দাদামশায় বললে, এ না হলে মানুষের দিন কাটত না। কত আরব্য-
উপন্যাস, পারস্য-উপন্যাস, পঞ্চতন্ত্র, কত কী সাজানো হয়ে গেল। মানুষ
অনেকখানি ছেলেমানুষ, তাকে রূপকথা দিয়ে ভোলাতে হয়। আর
ভূমিকায় কাজ নেই। এবার শুরু করা যাক।—

এক যে ছিল রাজা, তাঁর ছিল না রাজরানী। রাজকন্যার সন্ধানে দূত গেল
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ মগধ কোশল কাশ্মীর। তারা এসে খবর দেয় যে, মহারাজ,
সে কী দেখলুম; কারু চোখের জলে মুক্তো ঝরে, কারু হাসিতে খসে
পড়ে মানিক! কারু দেহ চাঁদের আলোয় গড়া, সে যেন পূর্ণিমারাত্রের
স্বপ্ন।

রাজা শুনেই বুঝলেন, কথাগুলি বাড়িয়ে বলা, রাজার ভাগ্যে সত্য কথা
জোটে না অনুচরদের মুখের থেকে। তিনি বললেন, আমি নিজে যাব
দেখতে।

সেনাপতি বললেন, তবে ফৌজ ডাকি?

রাজা বললেন, লড়াই করতে যাচ্ছি নে।

মন্ত্রী বললেন, তবে পাত্র-মিত্রদের খবর দিই?

রাজা বললেন, পাত্র-মিত্রদের পছন্দ নিয়ে কন্যা দেখার কাজ চলে না।

তা হলে রাজহস্তী তৈরি করতে বলে দিই?

রাজা বললেন, আমার একজোড়া পা আছে।

সঙ্গে কয়জন যাবে পেয়াদা?

রাজা বললেন, যাবে আমার ছায়াটা।

আচ্ছা, তা হলে রাজবেশ পরুন— চুনিপান্নার হার, মানিক-লাগানো মুকুট, হীরে-লাগানো কাঁকন আর গজমোতির কানবালা।

রাজা বললেন, আমি রাজার সঙ সেজেই থাকি, এবার সাজব সন্নেসির সঙ।

মাথায় লাগালেন জটা, পরলেন কপনি, গায়ে মাখলেন ছাই, কপালে আঁকলেন তিলক আর হাতে নিলেন কমণ্ডলু আর বেলকাঠের দণ্ড। ‘বোম্ বোম্ মহাদেব’ বলে বেরিয়ে পড়লেন পথে। দেশে দেশে রটে গেল— বাবা পিনাকীশ্বর নেমে এসেছেন হিমালয়ের গুহা থেকে, তাঁর একশো-পঁচিশ বছরের তপস্যা শেষ হল।

রাজা প্রথমে গেলেন অঙ্গদেশে। রাজকন্যা খবর পেয়ে বললেন, ডাকো আমার কাছে।

কন্যার গায়ের রঙ উজ্জ্বল শ্যামল, চুলের রঙ যেন ফিঙের পালক, চোখ দুটিতে হরিণের চমকে-ওঠা চাহনি। তিনি বসে বসে সাজ করছেন। কোনো বাঁদি নিয়ে এল স্বর্ণচন্দন বাটা, তাতে মুখের রঙ হবে যেন চাঁপাফুলের মতো। কেউ বা আনল ভূঙ্গলাঙ্গুন তেল, তাতে চুল হবে যেন পম্পাসরোবরের ঢেউ। কেউ বা আনল মাকড়সাজাল শাড়ি। কেউ বা আনল হাওয়াহালকা ওড়না। এই করতে করতে দিনের তিনটে প্রহর যায় কেটে। কিছুতেই কিছু মনের মতো হয় না। সন্নেসিকে বললেন, বাবা, আমাকে এমন চোখ-ভোলানো সাজের সন্ধান বলে দাও, যাতে রাজরাজেশ্বরের লেগে যায় ধাঁধা, রাজকর্ম যায় ঘুচে, কেবল আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দিনরাত্রি কাটে।

সন্ন্যাসী বললেন, আর-কিছুই চাই না?

রাজকন্যা বললেন, না, আর-কিছুই না।

সন্ন্যাসী বললেন, আচ্ছা, আমি তবে চললেম, সন্ধান মিললে নাইয় আবার দেখা দেব।

রাজা সেখান থেকে গেলেন বঙ্গদেশে। রাজকন্যা শুনলেন সন্ন্যাসীর নামডাক। প্রণাম করে বললেন, বাবা, আমাকে এমন কণ্ঠ দাও যাতে আমার মুখের কথায় রাজরাজেশ্বরের কান যায় ভরে, মাথা যায় ঘুরে, মন হয় উতলা। আমার ছাড়া আর কারও কথা যেন তাঁর কানে না যায়। আমি যা বলাই তাই বলেন।

সন্ন্যাসী বললেন, সেই মন্ত্র আমি সন্ধান করতে বেরলুম। যদি পাই তবে ফিরে এসে দেখা হবে।

বলে তিনি গেলেন চলে।

গেলেন কলিঙ্গে। সেখানে আর-এক হাওয়া অন্দরমহলে। রাজকন্যা মন্ত্রণা করছেন কী করে কাঞ্চী জয় করে তাঁর সেনাপতি সেখানকার মহিষীর মাথা হেঁট করে দিতে পারে, আর কোশলের গুমরও তাঁর সহ্য হয় না। তার রাজলক্ষ্মীকে বাঁদি করে তাঁর পায়ে তেল দিতে লাগিয়ে দেবেন।

সন্ন্যাসীর খবর পেয়ে ডেকে পাঠালেন। বললেন, বাবা, শুনেছি সহস্রগ্নী অস্ত্র আছে শ্বেতদ্বীপে যার তেজে নগর গ্রাম সমস্ত পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আমি যাকে বিয়ে করব, আমি চাই তাঁর পায়ের কাছে বড়ো বড়ো রাজবন্দীরা হাত জোড় করে থাকবে, আর রাজার মেয়েরা বন্দিনী হয়ে কেউ বা চামর দোলাবে, কেউ-বা ছত্র ধরে থাকবে, আর কেউ-বা আনবে তাঁর পানের বাটা।

সন্ন্যাসী বললেন, আর-কিছু চাই নে তোমার?

রাজকন্যা বললেন, আর-কিছুই না।

সন্ন্যাসী বললেন, সেই দেশ-জ্বালানো অস্ত্রের সন্ধান চলেম।

সন্ন্যাসী গেলেন চলে। বললেন, ধিক্।

চলতে চলতে এসে পড়লেন এক বনে। খুলে ফেললেন জটাজূট। ঝরনার জলে স্নান করে গায়ের ছাই ফেললেন ধুয়ে। তখন বেলা প্রায় তিনপ্রহর। প্রখর রোদ, শরীর শান্ত, ক্ষুধা প্রবল। আশ্রয় খুঁজতে খুঁজতে নদীর ধারে দেখলেন একটি পাতার ছাউনি। সেখানে একটি ছোটো চুলা বানিয়ে একটি মেয়ে শাকপাতা চড়িয়ে দিয়েছে রাঁধবার জন্য। সে ছাগল চরায় বনে, সে মধু জড়ো করে রাজবাড়িতে জোগান দিত। বেলা কেটে গেছে এই কাজে। এখন শুকনো কাঠ জ্বালিয়ে শুরু করেছে রান্না। তার পরনের কাপড়খানি দাগপড়া, তার দুই হাতে দুটি শাঁখা, কানে লাগিয়ে রেখেছে একটি ধানের শিষ। চোখ দুটি তার ভোমরার মতো কালো। স্নান করে সে ভিজে চুল পিঠে মেলে দিয়েছে যেন বাদলশেষের রান্তির।

রাজা বললেন, বড়ো খিদে পেয়েছে।

মেয়েটি বললে, একটু সবুর করুন, আমি অন্ন চড়িয়েছি, এখনই তৈরি হবে আপনার জন্য।

রাজা বললেন, আর, তুমি কী খাবে তা হলে।

সে বললে, আমি বনের মেয়ে, জানি কোথায় ফলমূল কুড়িয়ে পাওয়া যায়। সেই আমার হবে ঢের। অতিথিকে অন্ন দিয়ে যে পুণ্য হয় গরিবের ভাগ্যে তা তো সহজে জোটে না।

রাজা বললেন, তোমার আর কে আছে।

মেয়েটি বললে, আছেন আমার বুড়ো বাপ, বনের বাইরে তাঁর কুঁড়েঘর।
আমি ছাড়া তাঁর আর কেউ নেই। কাজ শেষ করে কিছু খাবার নিয়ে যাই
তাঁর কাছে। আমার জন্য তিনি পথ চেয়ে আছেন।

রাজা বললেন, তুমি অন্ন নিয়ে চলো, আর আমাকে দেখিয়ে দাও সেইসব
ফলমূল যা তুমি নিজে জড়ো করে খাও।

কন্যা বললে, আমার যে অপরাধ হবে।

রাজা বললেন, তুমি দেবতার আশীর্বাদ পাবে। তোমার কোনো ভয় নেই।
আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলো।

বাপের জন্য তৈরি অন্নের থালি সে মাথায় নিয়ে চলল। ফলমূল সংগ্রহ
করে দুজনে তাই খেয়ে নিলে। রাজা গিয়ে দেখলেন, বুড়ো বাপ
কুঁড়েঘরের দরোজায় বসে।

সে বললে, মা, আজ দেরি হল কেন।

কন্যা বললে, বাবা, অতিথি এনেছি তোমার ঘরে।

বৃদ্ধ ব্যস্ত হয়ে বললে, আমার গরিবের ঘর, কী দিয়ে আমি অতিথিসেবা
করব।

রাজা বললেন, আমি তো আর কিছুই চাই নে, পেয়েছি তোমার কন্যার
হাতের সেবা। আজ আমি বিদায় নিলেম। আর-একদিন আসব।

সাত দিন সাত রাত্রি চলে গেল, এবার রাজা এলেন রাজবেশে। তাঁর অশ্ব
রথ সমস্ত রইল বনের বাহিরে। বৃদ্ধের পায়ের কাছে মাথা রেখে প্রণাম
করলেন; বললেন, আমি বিজয়পত্তনের রাজা। রানী খুঁজতে
বেরিয়েছিলাম দেশে বিদেশে। এতদিন পরে পেয়েছি— যদি তুমি আমায়
দান কর, আর যদি কন্যা থাকেন রাজি।

বৃদ্ধের চোখ জলে ভরে গেল। এল রাজহস্তী— কাঠকুড়ানি মেয়েকে পাশে
নিয়ে রাজা ফিরে গেলেন রাজধানীতে।

অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের রাজকন্যারা শুনে বললে, ছি!

*

* *

আসিল দিয়াড়ি হাতে রাজার ঝিয়ারি
খিড়কির আঙিনায়, নামটি পিয়ারি।
আমি শুধালেম তারে, এসেছ কী লাগি।
সে কহিল চুপে চুপে, কিছু নাহি মাগি।
আমি চাই ভালো ক’রে চিনে রাখো মোরে,
আমার এ আলোটিতে মন লহো ভরে।
আমি যে তোমার দ্বারে করি আসা-যাওয়া,
তাই হেথা বকুলের বনে দেয় হাওয়া।
যখন ফুটিয়া ওঠে যুথী বনময়
আমার আঁচলে আনি তার পরিচয়।
যেথা যত ফুল আছে বনে বনে ফোটে,
আমার পরশ পেলে খুশি হয়ে ওঠে।
শুকতারা ওঠে ভোরে, তুমি থাক একা,

আমিই দেখাই তারে ঠিকমত দেখা।
যখনি আমার শোনে নূপুরের ধ্বনি
ঘাসে ঘাসে শিহরণ জাগে-যে তখনি।
তোমার বাগানে সাজে ফুলের কেয়ারি,
কানাকানি করে তারা, এসেছে পিয়ারি।
অরুণের আভা লাগে সকালের মেঘে,
‘এসেছে পিয়ারি’ ব’লে বন ওঠে জেগে।
পূর্ণিমারাতে আসে ফাগুনের দোল,
‘পিয়ারি পিয়ারি’ রবে ওঠে উতরোল।
আমের মুকূলে হাওয়া মেতে ওঠে গ্রামে,
চারি দিকে বাঁশি বাজে পিয়ারির নামে।
শরতে ভরিয়া উঠে যমুনার বারি,
কূলে কূলে গেয়ে চলে ‘পিয়ারি পিয়ারি’ ।